১) বাংলা পৌরাণিকের ধারা :

উঃ) বাংলা নাটকের সূত্রপাত আটটিল উনবিংশ শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে নতুন করে ইংরেজদের কি বিনোদনের জন্য যে রঙ্গমঞ্চ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল পরবর্তী কালে বাঙালির ধনী শ্রেণি সামাজিক তা সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিল। প্রাথমিক ভাবে রঙ্গমঞ্চ প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনুবাদ শিল্প ধারা ও প্রেরণায় বাংলা নাট্য সাহিত্য গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

□ বাংলা দেশে এর আগে যাত্রার প্রচলন থাকলেও পাশ্চাত্য থিয়েটার তার থেকে আলাদা ছিল। কিন্তু বাংলা নাটক সৃষ্টির শুরুতে নাট্যকারেরা এই দুই ধারাকে একত্রিত করতে সাহায্য করে ছিলেন। ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রথম বাংলা নাটকের মধ্য ভাগে তা একটি উপাদানের সাহিত্য রূপে নির্মিত হয়েছিল। সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণ কিন্তু অন্তরঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারি। প্রথম যুগের বাংলা নাটক এই জন্য মূলত সংস্কৃত অনুবাদ আবার ইংরেজি শিক্ষিত নাটকের অভিনেতা রচিত।

□ বাংলা নাটকের সূত্রপাতের যুগের বাংলা পৌরাণিক নাটকের ও সূত্রপাত। ১৮৫৩ তে প্রথম যে দুটি নাটক প্রথম বাংলা নাটক লিখেছা হয় তার মধ্যে তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' মার বিষয় বস্তু মহাভারতের সুভদ্রা হরণ কাহিনী কিন্তু নাটকটি উপস্থাপিত হয়েছিল পাশ্চাত্য রীতির অঙ্ক দৃশ্য মেনে। এর পর একে একে হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৮) কালীপ্রসন্ন সিংহের সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮), মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮) পদ্মাবতী (১৮৬০) রামনারায়ণ তর্করত্নের রুক্মিণী হরণ (১৮৭১) কংসবধ (১৮৭৫), রিহিরিয়ম (১৮৭৫) ইত্যাদি নাটকগুলি রচিত হতে থাকে। ১৮৭২ এ জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর বাংলা নাটকে একটা পালাবদল ঘটে। তাই রামনারায়ণ পর্যন্ত রচিত পৌরাণিক নাটক গুলিকে

প্রথম পৌরাণিক নাটক বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে কেবলমাত্র পৌরাণিক কাহিনী ছেড়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশ্চাত্য নাট্যশৈলি অনুসারি সংলাপ আর প্রতিঘাত, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বিকাশ কিছুই দেখানো হয়নি। তবু এদের মধ্যে মধুসূদন তুলনামূলকভাবে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব রেখেছেন। তার রচিত দুটি পৌরাণিক নাটকের একটি, ~~[illegible]~~ হলো (শর্মিষ্ঠা) যেগুলি পুরাণ অনুসরণে লেখা হলেও পদ্মাবতি নাটকের কাহিনী গ্রিক পুরাণ থেকে নেওয়া। তাঁর চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন স্বগত সংলাপের মধ্যে দিয়ে। মধুসূদনের নাটকগুলিতে (৩) সংস্কৃত নাট্যশৈলির পাশাপাশি বিদেশি নাট্যকার পরিচয় করে নাটকিয়তার মূল সংযোজিত হয়েছে। সেকারণে প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাট্যকারদের মধ্যে মধুসূদনই শ্রেষ্ঠ।

□ এর পরবর্তি পর্যায়ে যে নাটকগুলি, তার মধ্যে রচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) পার্থ পরাজয় (১৮৮১) রামলীলা (১৮৮৩) ~~[illegible]~~ রাজকুমার রায়ের প্রতিজ্ঞা (১৮৭৫) প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৫) অতুল কৃষ্ণমিত্রের নন্দ উপকার, ইত্যাদি এই নাটকগুলিতে নাট্যকারেরা জনপ্রিয় গৌরহরি এবং সহজ খ্যাতির মোহে নাটকগুলিকে গীতাভিনয়ের দিকে চালিত করে এই নাটকগুলিতে ভক্তিবাদ প্রবলভাবে ~~[illegible]~~ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল।

□ বাংলা পৌরাণিক নাটকের যাঁরা ~~[illegible]~~ সর্বাগ্রগণ্য সম্মুখ কারিগর হলেন তিনিই হলেন তাঁর পৌরাণিক নাটক গুলিতে তাঁর অধ্যাত্মিক ও ভক্তি রসের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তার নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য জনা (১৮৯৩) পাণ্ডবগৌরব (১৯০০) জনার (১৯২২) পুরাণ কাহিনী অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩)।

অধিকাংশ এই নাটকগুলি হাতে গিরিশ চন্দ্রের বিশ্বাস্যোগ্য কয়েকটি নিজস্ব নাটক রেখেছেন এগুলির মধ্যে পৌরাণিক ভাব ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় এর মধ্যে রয়েছে চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস (১৮৮৫) বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৮৮৩) পূর্ণচন্দ্র (১৮৮৮), শঙ্করাচার্য (১৯১০) ইত্যাদি। গিরিশ চন্দ্রের পৌরাণিক নাটক গুলির বৈশিষ্ট্য এখানে তিনি যা তাঁর নাটক গুলিকে প্রকীর্তিত তত্ত্ব উপদেশ এবং ঐশ্বরিক ভক্তিবাদ প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে গিরিশ চন্দ্র রচনার ও অভিনয়ের সময়কালে জুড়ে বাংলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান এবং ভক্তিবাদ চেতনার প্রসার।

□ গিরিশ চন্দ্রের ~~সমকালীন সময়~~ পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার রচিত পাষাণী (১৯০০) সীতা (১৯০৮) দুর্গা (১৯১৪) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকে তিনি চরিত্রের মধ্যে মানবধর্ম আরোপ করলেন। ভক্তিরস অলৌকিকতাকে বর্জন করে মানব প্রকৃতির দ্বন্দ্ব সংঘাতে পেলিম কুন উপস্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি মিরাদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের দুর্গা ও নরনারায়ণ নাটকে ফুটিতে ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদ সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। তারপর মোহনচন্দ্র রায়ের সীতা নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের আধুনিক করণ ঘটেছে অর্থাৎ বলা যাচ্ছে গিরিশ পরবর্তী প্রথম দিকটা বাংলা পৌরাণিক নাটক গুলো পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা প্রশ্নের উপস্থাপন করতে চাইছে।

□ বাংলা পৌরাণিক নাটকে এক অন্যতম সিমান্ত তৃতীয় ~~এবং~~ পর্যায়ের মন্মথ রায়ের হাতে তার রচিত 'দেবাসুর' (১৯২৮) 'কারাগার' (১৯৩০) প্রভৃতি নাটকে তিনি পৌরাণিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন পুরাণকে সমকালীন

মুখোমুখি করে উপস্থাপন করেন পুরাণের সর্বজনবিদিত পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যে পুরাণ নবরূপে উজ্জীবিত হলো। মধুসূদন দত্তের প্রতিভা এখানেই বাংলা পৌরাণিক নাটকে মধুসূদন দত্তের যে উজ্জ্বল পৌঁছে দিলেন এবং পৌরাণিক আদর্শে সমকালীনতাকে যে ভাবে সমন্বয়িত করলেন তার সমকালীন উত্তর কালের নাট্যকারের কেউ সে পথে নিলেন তত্পর হননি।

□ মন্মথ রায়ের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা নাটকে পৌরাণিক নাট্যরচনার ধারা বিশেষ ভাবে দেখা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়, প্রাপ্ত স্বাধীনতা ইত্যাদি বাঙালির জন মানুষকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে পৌরাণিক নাটক কল্পনার মধ্যে দিয়ে উত্তরণের কোনো দিশা নাট্যকারেরা খুঁজে পাননি। তবে বর্তমানে কোনো কোনো নাট্যদল পৌরাণিক বিষয় বস্তু অবলম্বনে নাট্যায়িত করলেও নতুন নাটক রচনা করা যায় উঠেনি। মোটামুটি ভাবে মধুসূদন থেকে মন্মথ রায় পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক নাটক বিশেষ গতিপথে চলে আর থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং একটি বিশেষ সাহিত্যিক অভিজ্ঞানকে বহন করেছে।